জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি

ইউনিট ৬

ভূমিকা

জাতিসংঘ বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের সংগঠন। ১৯৪৫ সালে ৫১ টি রাষ্ট্র কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ একটি বহুপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা এর সনদে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। জাতিসংঘ মূলত একটি রাজনৈতিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং এটি অধি-রাষ্ট্রীক বা কোনো বিশ্ব সরকার নয়। জাতিসংঘ সনদের প্রধান দিকগুলো হলো: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে শান্তিভঙ্গের হুমকি নিবারণ ও দুরীকরণের জন্য, এবং আক্রমণ অথবা অন্যান্য শান্তিভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক বিরোধ বা আইনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির নিষ্পত্তি বা সমাধান; বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমঅধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও জাতিগোষ্ঠি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মৌল অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান। আর এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৬.১ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি**
- ✓ **পাঠ-৬.২ জাতিসংঘে বাংলাদেশ**
- ✓ **পাঠ-৬.৩ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা**

পাঠ-৬.১ জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থার ইতিহাস রাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে উঠে বিশেষ কিছু বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে। সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান, যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং যুদ্ধনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে হেগে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হেগ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে যে কনভেনশন প্রণীত হয় তার উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯০২ সাল থেকে কাজ শুরু করে। ১৯০৭ সালে যে হেগ সম্মেলন হয়, সেখানে ২৬ টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে এবং এই সম্মেলনেই প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠনের আকাঙ্খা রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে অনুভূত হয়। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে বিশ্বসংগঠন গঠনের ধারণাটি আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ১৯১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি প্যারিস সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন, যেখানে মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, যৌথ নিরাপত্তা, সাধারন নিরস্ত্রীকরণের বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয় এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় শান্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি বিশ্ব সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।

জাতিসংঘের পূর্বে লীগ অব নেশন্স নামের আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ ছিল। ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, শান্তি এবং নিরাপত্তা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ অব নেশন্স ৫৮ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছিল। শুরুতে লীগ অব নেশন্সের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হলেও ১৯৩০ সালের পর থেকে জার্মানী, ইতালি এবং জাপানের মতো অক্ষশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে লীগ অব নেশন্সের কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লীগ অব নেশন্স বিশ্বের শান্তি রক্ষার প্রধান লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষণা লীগ অব নেশন্স ব্যর্থ হলেও জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতারা লীগ অব নেশন্সের ধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। 'জাতিসংঘ' নামের প্রথম সূচনা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের দ্বারা এবং এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৪৫ সালের ১ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্পাদিত 'সম্মিলিত জাতিসমূহের ঘোষণার' মাধ্যমে, যেখানে ২৬টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ প্রথমবারের মতো অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে যুদ্ধে করার ঘোষণা দেয়। ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন সানফ্রানসিস্কোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রশ্নে 'জাতিসমূহের সম্মেলনে' ৫০ টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগষ্ট-অক্টোবরে ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রস্তাবগুলির ওপর ভিত্তি করে এই সনদ গড়ে ওঠে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও পরে এতে স্বাক্ষর প্রদান করে প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি রাষ্ট্রের একটিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৫ অক্টোবর চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও স্বাক্ষরকারী অন্যান্য অধিকাংশ দেশের সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ সংগঠন বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯২ এবং জাতিসংঘের কর্মপরিধি বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সনদে উল্লেখিত সমুদয় দায়দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সেরূপ অন্য সকল শান্তিপ্রিয় রাষ্টের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে (সনদের অনুচ্ছেদ নং ৪)। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ন্যায়বিচার নীতির উপর ভিত্তি করে শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং সকল মানুষের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক সংকট মুহূর্তে এই সংগঠন জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি করে ভারসাম্য বজায় রাখে। শান্তিরক্ষা, শান্তি সৃষ্টি, সংকট প্রতিরোধ এবং মানবীয় সাহায্যের জন্য জাতিসংঘ বেশী পরিচিত হলেও এই দিকগুলোর বাইরেও বিভিন্ন উপায়ে জাতিসংঘ এবং এর অঙ্গসংস্থাসমূহ (বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা, ফান্ড এবং কর্মসূচি) বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই সংগঠন বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন মৌলিক ইস্যু, যেমন টেকসই উন্নয়নের ধারণা থেকে শুরু করে পরিবেশ এবং শরণার্থীদের রক্ষণ, দুর্যোগ সহায়তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, নিরস্ত্রীকরণ এবং পারমানবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, ভূমি মাইন অপসারণ, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে থাকে।

পাঠ-৬.২ জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধু একটি মুক্তি আন্দোলন নয়, এটি একটি মৌলিক মানবাধিকার দলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতিসংঘ মূলত যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ; এবং শরণার্থীদের সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা চেয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্টের কাছে। সে সময়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ঢাকাস্থ প্রতিনিধির সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠকও করেছিলেন তাঁরা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে গণহত্যা সংঘঠিত হয়, তা সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য বিশ্বনেতার সঙ্গে সেদিন জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট এই গণহত্যাকে নিন্দা করে একে 'মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬ তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ প্লাজায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে আপোষ সম্ভাবনার পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বক্তব্য পাঠানো হয় এবং এটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল সেটা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা ও অর্থবলের প্রয়োজন ছিল, তা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে মেটানো সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ভারতে বাংলাদেশী শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালায়। শরণার্থীদের সহায়তার কাজে জাতিসংঘের এ সম্পৃক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম কৌশলগতভাবেও লাভবান হয়। পাকিস্তান এবং আরো কিছু দেশ এ সংগ্রামকে পাকিস্তানের 'আভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বলে চিত্রিত করার যে অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, জাতিসংঘের এই সাহায্যের ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাইকমিশনার সদরুদ্দিন আগা খান সহ উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ইউএনএইচসিআর ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ-সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে।

অন্যদিকে, তৎকালে অধিকৃত-বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে জন আর কেলির নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান রিলিফ অপারেশন (ইউএনইপিআরও) ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। পরে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এই দায়িত্ব নেন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল পদমর্যাদার পল ম্যাক্কি হেনরি। এ সময়ে মুজিবনগর সরকার অভিযোগ করে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা এ ত্রাণ কার্যক্রমের অপব্যবহার করছে। ১৬ নভেম্বর এ কার্যক্রমকে 'পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত' করে জাতিসংঘ নিজেই এর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রশাসনের উপর একটি নৈতিক আঘাত।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের যে বৈঠক হয় তাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন সাহায্য দিতে দাতাগোষ্ঠী অস্বীকার করে। 'পূর্ব পাকিস্তান কার্যত সরকারবিহীন রয়েছে' বিশ্ব ব্যাংকের এ মন্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) আলোচ্যসূচিতেও বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশনস ঢাকা (আনরড) নামে পরিচিত জাতিসংঘ

ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং একজন আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেলকে এর দায়িত্বভার দেয়া হয়। স্যার রবার্ট জ্যাকসনের পরিচালনায় শুরু হয় এই জাতিসংঘ ত্রাণকার্য। এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তির মুখে আনরডের নাম কিছুদিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হল আনরব-এ, যার পুরো নাম বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম। ১৯৭৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী আনরব তার জরুরী ত্রাণ এবং পুনর্বাসন তৎপরতা শেষ করে তখন এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত জাতিসংঘ পরিচালিত ত্রাণকার্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল আনরবের ত্রাণকার্য।

বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় যখন ১৯৭৩সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘ বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় সমর্থন দান করে। এ সময়ে জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধকালীন সময়ে বিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজসমূহও অপসারন করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের জাতিসংঘে যোগদান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের সনদ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে: 'আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি' (অনুচ্ছেদ-২৫)। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়টি সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার আলোকে প্রণীত হয়েছে, যা আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়।

১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রির নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৎপরতা চালায়। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পর পর দু'বার বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। যোগদানের এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ করলেও এর পূর্ব থেকেই জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে প্রথম জাতিসংঘ সংস্থায় সদস্যরূপে স্বাগত জানায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এর পর পরই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশিরভাগ বিশেষায়িত অঙ্গ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বসভায় তার ভূমিকা রেখে চলেছে এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। জাতীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ পাচঁটি প্রধান ক্ষেত্র যেমন উন্নয়ন, পরিবেশ, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিরক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের এক বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত দু'বার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) এর সদস্য হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হুমায়ুন রশিদ চৌধূরী ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দু'বার নির্বাচিত হয়, প্রথমবার জাপানকে পরাজিত করে ১৯৭৯-৮০ সালে এবং দ্বিতীয়বার ২০০০-২০০১ সালে। বাংলাদেশের প্রথমবারের (১৯৭৯-৮০) নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সে সময়ে বিশ্বে ঠান্ডাযুদ্ধকালীন অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং বিভিন্ন সংকটকালীন এজেন্ডা, যেমন: আরব-ইসরাইল উত্তেজনা, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামীদের আগ্রাসন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত

অনুপ্রবেশ, ইরানের হোস্টেজ ইস্যু, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফ্রিকান রাষ্ট্র রোডেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডা হিসেবে উত্থাপিত হয়।

বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কম্বোডিয়া এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ভেটো প্রদানে বিরত রাখতে ব্যর্থ হলেও অবরুদ্ধ আরবভূমিতে ইহুদি বসতিস্থাপনে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখে। তেহরানে আমেরিকান কূটনীতিকদের হোস্টেজ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির স্বীকৃতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেজ্যুলেশনে সমর্থন জ্ঞাপন করে। একই সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্রতিনিধি হয়ে জিম্বাবুয়ে থেকে রোডেশিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে যে নির্বাচন হয়, তার তদারকি করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের যে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞা কমিটি হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হয়।

বিশ্বের পরিবর্তিত কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদে দ্বিতীয় মেয়াদে সদস্যপদ লাভের সময়েও (২০০০-২০০১) বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এঙ্গোলা, বসনিয়া হার্জেগোভিনা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (ডিআরসি), ইরাক, কসোভো, সিয়েরা লিয়ন এবং পূর্ব তিমুরের মতো বিষয়গুলো এ সময়ের নিরাপত্তা পরিষদের প্রাধান্য বিস্তারকারী ইস্যু হিসেবে বিবেচিত। এসময়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ দুটো কমিটি, সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক কমিটি এবং অনুমোদনের ভূমিকা বিষয়ক কার্যকমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০০ সালের মার্চ মাসে এবং ২০০১ সালের জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক শক্তিশালী প্রবক্তা হিসেবে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে জাতিসংঘ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক প্রস্তুতিমুলক কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ দায়িত্ব পালন করে এবং ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে পাশকৃত পারমানবিক অস্ত্র প্রসার রোধ বিষয়ক চুক্তি(এনপিটি) প্রণয়নে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া ১৯৮২-৮৩ মেয়াদে ৭৭ জাতি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ১৯৮০ থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ কাজ করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৫ সালে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) এবং ১৯৯৮ সালে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সিটিডি কমিটির হাইকমিশনার নিযুক্ত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৮৩-২০০০ মেয়াদে এবং ২০০৬-২০০৮ মেয়াদে কাজ করে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রধান সম্মেলনগুলোতে বরাবরই অংশগ্রহণ করে। বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে জাতিসংঘের আহবানে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়েছে বাংলাদেশ সবক'টিতেই অংশগ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন ঘোষণা, প্যান অব অ্যাকশন প্রণয়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন, চুক্তি এবং প্রটোকল যা বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন হয়েছে সেগুলো হলো: সকল প্রকার বর্ণগত বৈষম্য বিলোপে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, নারীদের বিরুদ্ধে সবধরনের বৈষম্য বিলোপে কনভেনশন (সিডো), শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট, এন্টি পারসোন্যাল মাইন ব্যবহার প্রতিরোধ বিষয়ক চুক্তি, মরুভুমিকরণ প্রতিরোধে জাতিসংঘ কনভেনশন (ইউএনসিসিডি), রিও জীববৈচিত্র্য কনভেনশন, ভিয়েনা কনভেনশন, মন্ট্রিল প্রটোকল, লন্ডন এমেন্ডমেন্ট, কোপেনহেগেন এমেন্ডমেন্ট, মন্ট্রিল এমেন্ডমেন্ট, বেইজিং এমেন্ডমেন্ট।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৪ তম অধিবেশনে অ্যাকশন ফর এ কালচার অব পিস কর্মসূচী ঘোষণার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং কমিশনেরও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। বর্তমানে জাতিসংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতময় এলাকায় চলমান শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, যার সঙ্গে বাংলাদেশ গভীরভাবে জড়িত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানে থাকা দেশসমূহের অন্যতম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এ ভূমিকার সূত্রপাত ঘটে ১৯৮৮সালে ইরান-ইরাক মিলিটারি অবজারভেশন গ্রুপ (ইউএনআইআইএমওজি) এবং নামিবিয়াতে কার্যত ইউনাইটেড নেশনস ট্রান্জিশন অ্যাসিসট্যান্স গ্রুপে (ইউএনটিএজি) যোগদানের মাধ্যমে।

২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০,৫৭৪ জন (সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ) শান্তিরক্ষী সদস্যকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান

করে এবং ১২ টি মিশনে ১১ টি রাষ্ট্রে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা দেশের জন্য অন্যতম শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শক্তি। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা তাঁদের দায়িত্ববোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং দক্ষতা দ্বারা উচু মর্যাদায় আসীন হয়েছে এবং তা বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃত ও প্রসংশিত হয়েছে। সংকটকালীন সময়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় ঝুকিপূর্ণ দায়িত্ব পালনকালে ৮৮ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষা কর্মী এ পর্যন্ত তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ বর্তমানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম ব্যাপক আকারে দেখা যায়। বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ১০ টির বেশি জাতিসংঘ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার এবং জনগণের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের কাজের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে অর্থনীতি, বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবেশ, জরুরী সহায়তা, শিক্ষা, দুর্যোগ, খাদ্য, জেন্ডার ইস্যু, সুশাসন, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অভিগমন, পুষ্টি, অংশীদারিত্ব, জনসংখ্যা, দারিদ্র, শরণার্থী, শহরায়ন, কর্মসংস্থান এবং জীবনধারণ। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ দেশের সুশাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স তৈরিতে, এবং মানবাধিকার ইস্যু সমূহে ঝুকিপূর্ণ কর্মপরিকল্পনার উন্নয়নে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নীতিগত সমর্থন দিয়ে থাকে।

জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘ উন্নয়ন সহায়তাকারী কাঠামোর (আনডাফ) মাধ্যমে জাতিসংঘের সকল সংস্থা একত্রিত হয়ে যৌথভাবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বে উন্নয়ন ধারণার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান শাখা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) জাতিসংঘ টিমের সাথে একত্রিত হয়ে আনডাফ-এর বাস্তবায়ন এবং উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এই লক্ষ্যে ইউএনডিপি সরকারি সংস্থাসমূহকে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) তৈরিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার (ইউনেস্কো) উদ্যোগে সুন্দরবন এবং আরো কিছু ঐতিহাসিক স্থান বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পনেরো শতকে নির্মিত পাহাড়পুর বিহার এবং বাগেরহাটের বিভিন্ন মসজিদের সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইউনেস্কো ১৯৮৫ সালে এক আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও ইউনেস্কো প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং প্রতি বছর বিশ্বের সর্বত্র ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে এই দিন মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর তত্ত্বাবধানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, প্রজননকালীন স্বাস্থ্যসেবা, এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তার ক্ষেত্রে ইউনিসেফ বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা দেশের বৃহত্তর কৃষি সেক্টরের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের যে লক্ষ্য তা পূরণে পর্যাপ্ত ধান, গম এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে কৌশলগত পরামর্শমূলক সেবা এবং কমোডিটি সাপোর্ট দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইউএনএফপিএ এ পর্যন্ত ছয়টি কান্ট্রি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে সপ্তম কান্ট্রি প্রোগাম (২০০৬-২০১০) বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থিতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রেও ইউএনএফপিএ যুক্ত আছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বাংলাদেশের জনশক্তির শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং বাংলাদেশের শ্রম আইন আইএলও'র নীতিমালার সাথে ভারসাম্য রেখে প্রণীত হয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি) বাংলাদেশের কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রমে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (ইউএনএইচসিআর) বাংলাদেশ সরকারের সাথে মায়ানমার থেকে আগত ২৮,২০০ শরণার্থীর কল্যাণে এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে যৌথভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংক দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাংলাদেশের সহযোগী হয়ে কাজ করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক লোকজন এবং স্থানীয় স্টক হোল্ডারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রজেক্টে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (আইএমএফ)-এর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আইএমএফ'র ঋণ দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের বাণিজ্য সুবিধা উন্মুক্ত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগনের স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। ডব্লিউএইচও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং ঔষুধ নীতি পর্যবেক্ষন করছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের অনেক সংস্থা আর্থ-সামজিক প্রজেক্ট তৈরিতে সহায়তার লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ফেলোশীপ অথবা গবেষণার জন্য ফান্ড প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল জাতিসংঘের সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং জাতিসংঘের এই সংস্থাসমূহের একটি করে অফিসও বাংলাদেশে রয়েছে। বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘের বিগত বছরের যে সম্পর্ক তা দ্বারা বাংলাদেশ সংবিধানের কার্যকারিতা সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বে আরো সমুন্নত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত এবং অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিদ্ধন্দ্বিতা পূর্ণ দ্বিমেরু কেন্দ্রীক বিশ্বে জাতিসংঘ একমাত্র সংস্থা যা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারে। বাংলাদেশ নীতিগতভাবে তাই জাতিসংঘের মূলনীতিসমূহ মেনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-৬.৩ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর তার ৬ যুগ পূর্ণ হয়েছে। দেশে দেশে বিদ্যমান সংঘাত, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবতার নিরিখে জাতিসংঘ তার সেই সব উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। পরিমাপ করলে হয়তো ব্যর্থতার ভাগই বেশি হবে। জাতিসংঘ ব্যবহৃত হয়েছে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করার জন্য ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বিশ্ব থেকে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়নি বরং বেড়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একেবারে নীর ভূমিকার কারণেই নানা দেশে বেড়েছে হিংসা, বৈষম্য, যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানি এবং প্রাণহানি। রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও অনেক দেশ হারিয়েছে স্বাধীনতা, বরণ করেছে পরাধীনতা। ক্ষুদ্র এবং দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ থেকে আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তাই বিশ্ব এখনো অশান্তি এবং অস্থিরতায় ভরা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যুদ্ধ এবং সংঘাতে জর্জরিত বিশ্ব এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তাহীন। নিরপেক্ষ এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারনে জাতিসংঘের প্রতি বিশ্ববাসীর সৃষ্টি হয়েছে আস্থাহীনতা। জাতিসংঘ মূলত আস্থা সংকটে ভূগছে। তাই এর সংস্কার ও সম্প্রসারণের দাবি উঠছে। জাতিসংঘের কাছ থেকে বিশ্ববাসী আরো বেশি দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক ভূমিকা আশা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বিশ্ববাসীকে যুদ্ধ এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তির দেয়ার জন্য ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লীগ অব নেশন। কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের অবাধ্যতা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় বিশ্বসংস্থা লীগ অব নেশন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ক্রমান্বয়ে তা অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই লীগ অব নেশন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ভেঙ্গে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধ-হানাহানি বন্ধ না হয়ে বরং আরো বেড়ে যায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হবার পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পরে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ ও অশান্তি দূর করার জন্য আবার ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন এবং ফ্রান্স এই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ আর বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশই এর সদস্য এবং এর সংখ্যা ১৯৩। এসব দেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে, তাদের শান্তি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে পৃথিবীর মানুষকে রেহাই দেবার প্রত্যাশায়। কিন্তু বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের সদস্য হলেও শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা মোটেই নিরপেক্ষ নয়। তাদের হাত থেকে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে জাতিসংঘ সনদেই তার ব্যর্থতার বীজ নিহিত রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে ভেটো ক্ষমতা, যার মালিক হচ্ছে বৃহৎ পাঁচ রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন এবং ফ্রান্স। এরা সম্মিলিতভাবে কৌশলে এই ভেটো ক্ষমতা প্রবর্তন করেছে এবং এর মালিকানা নিজেরা নিয়ে নিয়েছে। মূলত এই ভেটো ক্ষমতা প্রবর্তনের ফলে সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে।

জাতিসংঘ কখনোই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বরং তারাই জাতিসংঘকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই পাচঁটি রাষ্ট্রের মধ্যে যার ক্ষমতা এবং দাপট যত বেশি সে জাতিসংঘকে তত বেশি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং শক্তিশালী তাই যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে গেছে এই জাতিসংঘের সার্বিক নিয়ন্ত্রক। যখনই জাতিসংঘে এই বৃহৎ পাচঁটি রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এসেছে তখনই এরা নিজেদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে আজ জাতিসংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে এর সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কথা উঠেছে এবং ক্রমশ এই দাবি জোরালো হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হবার জন্য চেষ্টা করছে। ভারত, জাপান, জার্মানি, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হবার জন্য চেষ্টা করছে।

বিশ্ববাসীকে যুদ্ধ এবং অশান্তি থেকে রক্ষা করাই ছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। জাতিসংঘে সনদের মূল কথা সকল রাষ্ট্রের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি, সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। কেউ অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। কোন রাষ্ট্রের সাথে অপর কোন রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দিলে তা জাতিসংঘের মাধ্যমে সমাধান হবে এবং জাতিসংঘের সেই সিদ্ধান্তের বাইরে কোন রাষ্ট্র কাজ করবে না।

কাগজে-কলমে সবাই জাতিসংঘের মূল সনদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলে ও বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শক্তিসমূহ বরাবরই পালন করেছে উল্টো ভূমিকা। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য এবং অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এসব বৃহৎ শক্তি সবসময় গায়ের জোরে নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করেছে এবং নিজেদের স্বার্থে সবসময় জাতিসংঘকে ব্যবহার করেছে। অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান দেখানো জাতিসংঘের মূল সনদের নির্দেশনা হলেও জাতিসংঘকেই পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শক্তির জোরে দখল করেছে ইরাক-আফগানিস্তান, যে দুটি রাষ্ট্রই জাতিসংঘের সদস্য। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ অসহায় এবং ব্যর্থ।

১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল জাতিসংঘে এবং গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এখন এই কাশ্মীর সংকট নিয়ে বছরের পর বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে ভারত পাকিস্তান যার কোনো সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এই ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসরাইল তাদের সামরিক শক্তিবলে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে নারকীয় নির্যাতন, বর্বরতা ও ভূমিদখলের তাণ্ডব। বিশ্বের নানা দেশের মধ্যস্থতা ও উদ্যোগে ফিলিস্তিনের উপর পরিচালিত ইসরাইলি হত্যা এবং নির্যাতন নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও জাতিসংঘ সরাসরি এ নিপীড়ন বন্ধ করতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। জাতিসংঘে এ পর্যন্ত যতবারই ইসরাইলের বর্বরতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন প্রস্তাব এসেছে ততবারই যুক্তরাষ্ট্র ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সেই প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়েছে।

বসনিয়ার দুই লক্ষাধিক বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির পেছনেও জাতিসংঘের ব্যর্থতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ও জাতিসংঘ সার্বদের বর্বরতার হাত থেকে বসনিয়ার নিরপরাধ বেসামরিক মানুষগুলোকে রক্ষা করতে পারেনি। চেচনিয়া আর মিন্দানাওয়ের মানুষ দীর্ঘদিনের সংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি কেবল জাতিসংঘের নীরব ভূমিকার কারণে। তবে পূর্বতিমুরের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এই জাতিসংঘই। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সেখানে গণভোট অনুষ্ঠান করে তার রায় অনুযায়ী পূর্বতিমুরকে স্বাধীন করা হয়েছে। অন্যদিকে লিবিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বন্ধে ও জাতিসংঘ চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে মিয়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধরা স্থানীয় আদিবাসী রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত নিধন চালালেও জাতিসংঘ তা বন্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। এ ধরণের নানা কারণে সম্প্রতি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা ও সক্ষমতা বারংবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

সারাংশ

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৪ অক্টোবর তার ৬ যুগ পূর্ণ হয়েছে। দেশে দেশে বিদ্যমান সংঘাত, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হলেও বাস্তবতার নিরিখে জাতিসংঘ তার সেই সব উদ্দেশ্য পূরণে পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। সফলতা ব্যর্থতা সবমিলিয়ে যাই হোক না কেনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারায় অনেক দেশের জন্য জাতিসংঘ এখনও আস্থার প্রতীক হয়ে টিকে আছে।